কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ :
ডিসেম্বর, ২০১৩

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

মুখবন্ধ

সি পি আই (এম)'র বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনে কখনও কখনও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতেও উত্থাপিত হতে পারে, তা হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ধাঁচে কোনও একটি কেন্দ্র থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট ও সমমনোভাবাপন্ন পার্টিগুলোর আন্দোলন ও সাংগঠনিক কার্যকলাপকে সমন্বিত করার জন্য সি পি আই (এম)'র দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন?

সবাই সবটা না জানলেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। অবশ্য, তিন-তিনটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমরা যে খুব একটা বেশি জানি, ঘটনা তা নয়। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছে এই তিনটি আন্তর্জাতিক। প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কাজ করেছে ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সক্রিয় ছিল ১৮৮৯ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় আন্তর্জাতিক, যাকে সংক্ষেপে বলা হতো কমিনটার্ণ, তার সময়কাল ছিল ১৯১৯ তেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত।

প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা করেন কার্ল মার্কস; দ্বিতীয়টির নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স; এবং তৃতীয়টির নেতৃত্বে ছিলেন ভি আই লেনিন এবং তাঁর মৃত্যুর পর যোশেফ স্ট্যালিন।

তখন এমন একটি সময়, যখন পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা দেশে। শ্রমিকশ্রেণিরও অভ্যুদয় ঘটে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার বোধই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের সচেতন উদ্যোগের ফলেই প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। তাঁরা শুধু কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি গঠনেও ভূমিকা নেন। তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ দুটোতেই তাঁরা ছিলেন নিরলস পথপ্রদর্শক। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে তত্ত্বকে যেমন নানা দিক থেকে আসা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণের প্রশ্নে অতি বাম ও ডান উভয় ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই চালাতে হয়। কারণ, এই উভয় ধরনের বিচ্যুতি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এটা একটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন সঠিক, তেমনি সঠিক বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। তিনটি আন্তর্জাতিকের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব সেই মতাদর্শগত লড়াইয়েরই ফল। তাতে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক না থাকলেও দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম জয়ী হয়েছে। আজও তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েনি। বরং, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে দেওয়ার আগে স্ট্যালিন ও কমিন্টার্নের অন্যান্য নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিস্তৃতি, ফ্যাসিবাদ- বিরোধী কাজে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দ্রুত মোকাবেলা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ইত্যাদি বিষয়গুলিতে আরও কার্যকরী স্বাধীন ভূমিকা ও উদ্যোগ নেওয়া সেই সময়ের চাহিদা হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই, ১৯৪০ সালে কমিন্টার্ণ বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন— " প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করার যে পথ গ্রহণ করেছিলো, যা সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে খুব প্রয়োজন ছিল, বর্তমানে তা আন্দোলনের মাত্রা ও অগ্রগতির ফলে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে জটিলতা বাড়ছে তা জাতীয় স্তরে শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলির আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করছে।"

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসানের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। যদিও, সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকা পর্যন্ত নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি একসঙ্গে মিলিত হতো মস্কোতে এবং বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে সেখানে আলোচনা- পর্যালোচনা হতো।

৭০-এর দশক থেকে চীন- সোভিয়েত তীব্র মতভেদের কারণে মস্কোর আলোচনা সভায় সব দেশের পার্টিগুলো হাজির হতো না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর প্রথম একটি কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, সি পি আই (এম)'র উদ্যোগে, ১৯৯৩ সালের ৫ মে থেকে। ৫ মে কার্লমার্কসের জন্মদিন। ২০০৯ সালেও নয়াদিল্লিতে বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী- লেনিনবাদী পার্টিগুলো মিলিত হয়েছিলো। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

মার্কসবাদী- লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্ব পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অবস্থা এবং শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে আগে থেকেই একটা সহমত গড়ে ওঠে যে, বিশ্বের কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টিগুলো হবে স্বাধীন এবং ছোট পার্টি কিংবা বড় পার্টি, শাসক দল কিংবা বিরোধী দলে থাকা পার্টিগুলোর থাকবে সমান অধিকারও সমান মর্যাদা। সময়ে সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে পার্টিগুলোর মধ্যে মতবিনিময় সংগঠিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজ্য পার্টি শিক্ষা সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' বইটি প্রকাশ করা হলো। স্বল্প পরিসরে ও কম দামে বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমরা আনন্দিত। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের পার্টি কর্মী ও দরদীরা এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আশা করি।

(বিজন ধর)
১২-৮-২০১৩
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই(এম)

আগরতলা
১২-৮-২০১৩

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

ভূমিকা

কঠোর অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং অমানবিক সামাজিক অবস্থাই মূলত শ্রমজীবীদের পুঁজিবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হতে বাধ্য করে। পুঁজিবাদী শোষণ ও পীড়নে শ্রমিকশ্রেণি শ্রেণি হিসাবে সচেতন হয়ে উঠে। ১৮শ ও ১৯ শ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় ধরে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ছোট বড় অসংখ্য ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রতিরোধ সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সংগ্রামগুলি দেশের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় শাসকশ্রেণি সেইগুলিকে কঠোরভাবে দমন করে। অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণিকে নিজ দেশের সীমানার বাইরে শ্রমিকশ্রেণির সাথে যোগাযোগ ও মৈত্রী গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়। এই সময়ই ইউরোপ ও আমেরিকাতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠে। শিল্প বিপ্লবের ফলে পণ্যের বাজারের বিস্তার ঘটেছে। একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণির উপর দমন পীড়নকে সব পুঁজিপতিরাই সমর্থন করে। এই অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণিকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিক ঐক্যই তাদের দমন পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ঐক্য গড়ার প্রয়াসের শুরু হয়। কিন্তু ঐক্যের মধ্যেও বিভিন্ন মত ও আদর্শের সংঘাত ঘটে চলে। এই অবস্থায় মার্কস ও এঙ্গেলস্ এ কথা অনুধাবন করতে সমর্থ হন যে, শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব পার্টি গঠন ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাঁদেরই নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। এই পার্টির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া ও পেটি -বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরোধিতা করা।

তার প্রথম যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৬ সালে মার্কস্ প্রতিষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট করেস্পনডেন্স' কমিটির মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে লীগ অব্ দ্য জাষ্ট নামে

সংগঠনটিতে ১৮৪৭ সালে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ যোগদান করেন। এই লীগ অব্ দ্য জাষ্টকেই পরবর্তী সময়ে 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়। কমিউনিস্ট লীগই প্রথম সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার দাবি তোলে। এই পর্যায়ে মার্কস্ প্রুধোঁর পেটি- বুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন শানিত করেন। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন দেশে ৫০ ও ৬০ দশকের তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতায় আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে অনুভূত হতে থাকে।

১৮৬৪ সালে মে মাসে ফরাসি শ্রমিক নেতা তুলিন আওয়াজ তোলেন যে, শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ঐক্য গড়ার মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণিকে রক্ষা করতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার বোধই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলা সম্ভব করে তোলে। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক দিয়ে শুরু এবং ১৯৪৩ সালে তার সমাপ্তি। এই মঞ্চটি একনাগাড়ে এই দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেনি। প্রথমে ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৬, যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত। তেমনি ভাবে ১৮৮৯- ১৯১৪ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এবং ১৯১৯ - ১৯৪৩ পর্যন্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক।

প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা

১৮৬৪ সালে ২৮ শে সেপ্টেম্বর মধ্য লন্ডনে লং একর এলাকায় সেন্ট মার্টিন হলের ছোট পরিসরে 'ইন্টার নেশন্যাল ওয়ার্কমেন্স এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রুধোঁপন্থী, ফরাসী গণতন্ত্রী, ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, চার্টিস্ট, ওয়েনবাদীসহ পেটি- বুর্জোয়া রেডিক্যালদের বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভার বিবরণে দেখা যায়, সভার উপস্থিত সদস্যরা শ্রমিকশ্রেণির একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ গড়ে ঘটনায় সামিল হতে পেরে খুব গর্বিত, উৎসাহিত এবং উত্তেজিত ছিলেন। বক্তাদের বক্তব্যে কখনো প্রতিবাদ হচ্ছিল আবার কখনো সমবেত জনতা কোন বক্তব্যকে প্রবল হাততালির মাধ্যমে সমর্থন করছিল। বক্তব্যের কোন সময়সীমা ছিল না। তবে,আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি গড়ে তোলার বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধি ও বক্তাদের কোন মতভেদ না থাকলেও মত এবং পথের ভিন্নতা ছিল।

সভা শুধুমাত্র সংগঠন গড়ে তোলার ঘোষণাই দিল। সংগঠনের শ্রেণি চরিত্র এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন উল্লেখ করল না। এধরনের সংগঠনের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটদের প্রভাবে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। একমাত্র মার্কস্‌বাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই একে প্রকৃত একটি শ্রমিকস্বার্থ রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক সংহতিবোধ সম্পন্ন ও সর্বহারাদের সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম। কমিটির সভায় আইন ও বিধি রচনা করার জন্য ৩০ জনের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। মার্কস্ এই উপ-কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এই উপ-কমিটির উপর এ বিষয়ে একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কমিটির সভার প্রথম দিকে মার্কস্ অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এই সময়ে ওয়েস্টন 'নীতির ঘোষণা' নামে একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং অন্যদিকে মাৎসিনীপন্থী ওল্‌ফও একটি প্রস্তাব পেশ করেন। অধিকাংশ সদস্যই এই দুটি খসড়াকেই 'জনসাধারণের প্রতি ঘোষণা' ছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির মঞ্চের দিকে নির্দেশিকা বলে মানতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত, ১৮ অক্টোবর কমিটি দুটো খসড়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনা করে তা বিবেচনার

জন্য উপ-কমিটির কাছে অর্পণ করে। উপ-কমিটি সেই দায়িত্ব মার্কসের উপর দেয়। অবশেষে ১ নভেম্বরের সভায় কমিটি মার্কস্ রচিত খসড়া ঐকমত্য হয়ে অনুমোদন করে। মার্কস্ রচিত আইন ও বিধি অনুসারেই 'ইন্টার নেশন্যাল ওয়ার্কমেন্স্ এসোসিয়েশন' বা প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজ শুরু হয়।

প্রথম কংগ্রেস

আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় জেনেভায় ১৮৬৬ সালে সেপ্টেম্বরে। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড থেকে যে সব প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই প্রুধোঁপন্থী। তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন ইংরেজ প্রতিনিধিরা। মার্কসের দেওয়া তথ্য ও বক্তব্যে তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

সংবিধি অনুমোদন করা সম্পর্কে কংগ্রেসে যখন আলোচনা আরম্ভ হলো, তখন প্রুধোঁপন্থীরা দাবি করলেন যে, যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদেরই শুধু আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে দেওয়া হবে। পারস্পরিক আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রশ্ন এবং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্ন যখন উঠলো তখন প্রুধোঁপন্থীরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ধর্মঘটের বিরোধী এবং তাঁরা পারস্পরিক সহায়ক সমিতি স্থাপনের সুপারিশ করলেন। নারী শ্রমিকদের প্রশ্নে তাঁদের অভিমত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁরা জনজীবনে ও উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণের বিরোধিতা করলেন। এমনকি তাঁরা একথা বলতেও দ্বিধা করলেন না যে, নারীর আসন গৃহকোণে। এভাবে তাঁরা তাদের অর্বাচীন ভাবধারা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের কর্মসূচীতে ঢোকাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ প্রস্তাবই কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে মার্কস্ যে থিসিস রচনা করেছিলেন, তা-ই কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এই থিসিসে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে ঘোষণা করা হয়। প্রলেতারিয়েতরা তাঁদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেই শুধু নয়, মজুরি-শ্রম ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার মহান লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবে এবং করবেও। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব শ্রমিকদের সামনে ট্রেড ইউনিয়নের বিপ্লবী ভূমিকাই তুলে ধরলো। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের

এই প্রস্তাব আজও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রকৃত বিপ্লবী ধারনার মডেল হিসাবেই দেশে দেশে সমাদৃত।

এই কংগ্রেসেই রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। আর সমর্থন ঘোষিত হলো পোল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি। আট ঘণ্টা কাজ, নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইন যাতে শ্রমিকদের স্বার্থে সরকার প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়, তার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে সংগ্রাম করতে হবে — এই নীতিও ঘোষিত হলো কংগ্রেসে।

আন্তর্জাতিক জেনেভা কংগ্রেস দেশে দেশে শ্রমিকদের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া এনে দিল। আন্তর্জাতিকের শাখা গঠিত হলো বিভিন্ন দেশে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং বেলজিয়ামের শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

প্রথম দিকে আন্তর্জাতিকের সংবাদ বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় স্থান পেতো। কিন্তু শ্রমিকদের ধর্মঘটে আন্তর্জাতিকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা আন্তর্জাতিকের কুৎসা রটনাতে মুখর হয়ে উঠলো। তারা তখন এই কথাই প্রচার করতে লাগল যে, আন্তর্জাতিক হচ্ছে " উত্তেজনা সৃষ্টিকারী একদল লোকের" সংগঠন, "যাদের কাছে পবিত্র বলে কিছুই নেই", তাদেরই সংগঠন এবং "অরাজকতা সৃষ্টি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্য"। এই সমস্ত প্রচারের মধ্য দিয়ে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আন্তর্জাতিকের উদয়ে বুর্জোয়া শাসকেরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লসেনে ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে। তখন বুর্জোয়া সরকারগুলি যে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হলো এই কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসেই ঘোষণা করা হলো যে, শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং সেজন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই তাদের প্রধান এবং সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য। এই ঘোষণাটির উপরই কংগ্রেস এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল যে, সিদ্ধান্ত করা হলো প্রতি বছরই এই ঘোষণাবাণীর পুনরুল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয় কংগ্রেস

আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ব্রাসেলস শহরে ১৮৬৮-র সেপ্টেম্বরে। এই কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধ। অষ্ট্রিয়া আর প্রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ (১৮৬৬) তখন শেষ হয়েছে। কিন্তু ঘনিয়ে আসছে ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কালো ছায়া। তাই এই কংগ্রেসে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং যেখানেই যুদ্ধ শুরু হবে সেখানেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য শ্রমিকদের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানানো হলো।

এই কংগ্রেসেই ধর্মঘটকে শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রামের অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। প্রুধোঁপন্থীরা অবশেষে এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে একমত হলেন।

সম্পত্তির প্রশ্নে এই কংগ্রেসে প্রচন্ড বিতর্কের সূচনা হলো। লসেন কংগ্রেসে (১৮৬৭) প্রস্তাব এসেছিল যে, জমিকে সাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হোক। ফরাসী প্রতিনিধিরা তখন সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় সে প্রস্তাব পরবর্তী কংগ্রেসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। এখন সেই প্রস্তাবই ব্যাপক আকারে উত্থাপিত করা হলো। প্রুধোঁপন্থী প্রতিনিধিরা এর তীব্র বিরোধিতা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩০-৪ ভোটে এ প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৫ জন ভোটদানে বিরত থাকলেন।

এই প্রস্তাবের মূলকথা হলো যে, জমি, পরিবহন ব্যবস্থা, রেল, কয়লা খনি এবং অন্যান্য খনি হচ্ছে রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি। রাষ্ট্রই জমি ইজারা দেবে কৃষকের কাছে। সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে একথাই সুস্পষ্ট হলো যে, কমিউনিস্ট মূলনীতির প্রতি আন্তর্জাতিক তার আনুগত্য ঘোষণা করেছে।

ব্রাসেলস্ কংগ্রেসে যদিও প্রুধোঁবাদের পরাজয় ঘোষিত হলো। কিন্তু এই প্রুধোঁর স্থান এসে দখল করলো নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিন। তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে আরো প্রচন্ড সংগ্রাম চালাতে হলো।

চতুর্থ কংগ্রেস

আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় বাসলে শহরে ১৮৬৯ সালে। এই কংগ্রেসেই সংঘর্ষ বাঁধলো বাকুনিনের সঙ্গে। তিনি উত্তরাধিকার ব্যবস্থার

উচ্ছেদের দাবি পেশ করলেন। তাঁর মতে এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থাই "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার অসম্ভব করে তুলেছে এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

জেনারেল কাউন্সিলের সদস্যরা বাকুনিনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং তাঁরা দেখালেন যে,উত্তরাধিকারই কারণ নয় , সেটা হলো বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফল। বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে জেনারেল কাউন্সিলের সমর্থকদের সংগ্রাম কংগ্রেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, তা বিস্তৃত হলো আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন শাখায়। এ সংগ্রাম তীব্র আকার ধারন করলো সুইজারল্যান্ডে যেখানে ১৮৭০ সালে আন্তর্জাতিকের শাখা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

প্যারী কমিউন ও আন্তর্জাতিক

ইউরোপের যুগান্তকারী ঘটনা — প্যারী কমিউন। শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চের সশস্ত্র অভিযান যখন প্যারী কমিউনের জন্ম দিল তখন আন্তর্জাতিক এর পাশে এসেই দাঁড়ালো। শত্রুর আক্রমণ থেকে কমিউনকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির কাছে উদাত্ত আহ্বান জানালো এবং ঘোষণা করলো যে কমিউনকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিশ্বের সকল শ্রমিকের।

১৮৭১ সালের মে মাসে প্যারী কমিউনের পতন ঘটলো। কমিউনের পতন প্রচন্ড আঘাত হানলো আন্তর্জাতিকের উপরে। ফ্রান্সে বুর্জোয়ারা শ্রমিক আন্দোলনের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করলো। কমিউনকে সমর্থন করার জন্য জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের উপর শুরু হলো শাসকদের আক্রমণ।

এই প্যারী কমিউনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিকের মধ্যে মার্কস্‌পন্থী আর বাকুনিনপন্থীদের সংগ্রাম আবার তীব্র হয়ে উঠলো। মার্কস্ কমিউনকে দেখেছিলেন শ্রমিকশ্রেণির সরকার হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তি যার মাধ্যমে রূপায়িত হতে পারবে তার রাজনৈতিক রূপ হিসাবে। কিন্তু বাকুনিন কমিউনকে দেখেছিলেন রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার রূপ হিসাবে। তাঁর মতে প্যারিসে বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই কমিউন মারাত্মক ভুল করেছিল।

রাজনৈতিক পার্টি গঠনের শ্লোগান

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে আন্তর্জাতিকের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, "সমাজ বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য এবং তার মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ শ্রেণিসমূহের উচ্ছেদ সাধন করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে একটি রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত করার কাজ একান্ত প্রয়োজন।"

এই প্রস্তাবে আন্তর্জাতিকের সকল সদস্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

এইভাবে রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণির হস্তক্ষেপ না করার যে ভাবধারা বাকুনিন প্রচার করে আসছিলেন, তা আন্তর্জাতিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করা হলো।

কিন্তু বাকুনিনপন্থীরা দমবার পাত্র নয়। সুইজারল্যান্ডের আন্তর্জাতিকের শাখায় যে ভাঙ্গন তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন ১৮৭০ সালে, তাকে তাঁরা বিস্তৃত করলেন ইতালিতে, বেলজিয়ামে এবং স্পেনে। তাঁরা দাবি করলেন যে, আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। কোনো দেশের শাখার বা সেকশনের কাজে জেনারেল কাউন্সিলের হস্তক্ষেপ করা চলবে না। সংক্ষেপে তাঁরা চাইলেন জেনারেল কাউন্সিলকে একটি 'চিঠির বাক্সে' পরিণত করতে।

১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কস যে সাময়িক নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই ১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বরে লন্ডনের সম্মেলনে " শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী" নামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই নিয়মাবলীতে "কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকার এবং অধিকার ব্যতিরেকে কর্তব্য" ও " সামাজিক বিপ্লব ও তার শেষ লক্ষ্য" এই দুটি শিরোনামে মোট ১৩ টি নিয়ম আছে।

নিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে

* শ্রমিকশ্রেণির রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্তি — এই লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সংঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো।

*এই সমিতির নাম হবে “ শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি”।

* সমিতির শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি বৎসর শ্রমজীবী মানুষের একটি সাধারণ কংগ্রেস অধিবেশন হবে। কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করবে, আন্তর্জাতিক সমিতির কাজকে সফলভাবে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংস্থার সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করবে।

* প্রত্যেক কংগ্রেস পরবর্তী কংগ্রেসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন। এর জন্য তাঁদের কোনো বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হবে না। প্রয়োজনে স্থানের পরিবর্তন হলেও অধিবেশন স্থগিত রাখার ক্ষমতা এই পরিষদের নেই।

* আন্তর্জাতিক সমিতিতে যেসব দেশের প্রতিনিধিত্ব আছে তাদেরই শ্রমিক সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

* মালিকশ্রেণির যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলিতারিয়েতরা শ্রেণি হিসাবে সক্রিয় হতে পারে তখনই যখন তারা নিজেদের এমন একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিতে গঠিত করে, যে পার্টি মালিকশ্রেণি দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরোনো পার্টির বিরোধী।

* যোগাযোগের সুবিধার জন্য সাধারণ পরিষদ কিছুকাল পর পর বিবরণী প্রকাশ করবে।

* যারাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতিসমূহ স্বীকার ও সমর্থন করবে তাদের প্রত্যেকেই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রত্যেক শাখা সেই শাখা কর্তৃক গৃহীত সদস্যদের সততার জন্য দায়ী থাকবে।

* আন্তর্জাতিক সমিতির কোনো সদস্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে তার বাসস্থান পরিবর্তন করলে তিনি সংস্থাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য পাবেন।

* প্রত্যেক কংগ্রেসে এই নিয়মাবলী সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সেরূপ সংশোধনের পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনভাগের দুভাগের সমর্থন

চাই।

* শ্রমজীবী মানুষের যে সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিক সমিতিতে যোগ দিচ্ছে সেগুলি ভ্রাতৃত্বসূচক সহযোগিতার চিরস্থায়ী বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হলেও, তাদের বর্তমান সংগঠনকে অক্ষুন্ন রাখবে।

পঞ্চম কংগ্রেস

১৮৭২ সালে হেগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে বাকুনিনপন্থীদের জেনারেল কাউন্সিলের ক্ষমতা খর্ব করার দাবি অগ্রাহ্য করা হলো। এই কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক ব্যাপারে কেন্দ্রিকরণ ও শৃঙ্খলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শাখার উপর কর্তৃত্ব অটুট রাখার জন্য জেনারেল কাউন্সিলকে সকল ক্ষমতা দেওয়া হলো।

এই কংগ্রেসে গৃহীত আরেকটি প্রস্তাব নিজ নিজ দেশে প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হলো। এই পার্টির নেতৃত্বেই শ্রমিকশ্রেণি দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করবে।

বাকুনিনপন্থীদের আন্তর্জাতিকে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার কার্যকলাপ একটি বিশেষ কমিশন বসিয়ে তদন্ত করা হলো। সেই তদন্তে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হলো যে, বাকুনিন তাঁর নিজস্ব সংগঠন ‘এলায়েন্স’- কে শুধু উপর উপর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি এই সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সে কাজ ছিল জেনারেল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা। কমিশনের এই অভিমতের পর কংগ্রেস বাকুনিনকে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

এই কংগ্রেসে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব অনুসারে জেনারেল কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় দপ্তর লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাকুনিনপন্থীদের প্রভাব থেকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণির প্রভাবে যারা দিনের পর দিন ডুবে যাচ্ছিল সে ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের প্রভাব থেকে জেনারেল কাউন্সিল যাতে মুক্ত থাকতে পারে তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভাঙ্গন

হেগ কংগ্রেসের এইসব সিদ্ধান্ত কিন্তু আন্তর্জাতিকের মধ্যে ভাঙ্গন ঠেকাতে পারল না। ঐ বছরই (১৮৭২) বাকুনিনপন্থীরা তাঁদের নিজস্ব নৈরাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করলো। তাতে এসে যোগ দিল ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক সেকশানগুলির অধিকাংশ সদস্য। অবশ্য ওদের এই আন্তর্জাতিক টিকেছিল ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত।

ষষ্ঠ কংগ্রেস

আন্তর্জাতিকের কাজকর্ম চালাবার অনুকূল আবহাওয়া ফ্রান্সে এবং ইংল্যান্ডে পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় ১৮৭৩ সালে জেনেভায় বসল আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস। সে কংগ্রেস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এটিই আন্তর্জাতিকের শেষ কংগ্রেস।

ইউরোপ থেকে আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তর আমেরিকাতে সরিয়ে নেয়া হয়। ইউরোপের সাথে যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়ে এবং আমেরিকাতেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ঝোঁকের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয়। অন্যদিকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন তখন বিকাশের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। সে যুগ হল দেশে দেশে প্রলেতারিয়েতের নিজ নিজ সংগঠনকে সুদৃঢ় করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করার যুগ। তাই ১৮৭৬ সালে ১৫ জুলাই ফিলাডেলফিয়া শহরে আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে আন্তর্জাতিককে ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হলো।

এঙ্গেলস বলেছিলেন, তখনকার পরিস্থিতিতে " পুরোনো রূপে এ আন্তর্জাতিকের উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে।" তাই ভেঙ্গে দেওয়া হল আন্তর্জাতিক।

প্রথম আন্তর্জাতিকের তাৎপর্য

প্রথম আন্তর্জাতিক অনুঘটক হিসাবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণিকে আন্তর্জাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে গেছে। এর স্থায়িত্ব অল্প সময়ের হলেও এই অল্প সময়েই এর প্রভাব প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭০ সালেই ১০টির বেশি দেশে আন্তর্জাতিকের শাখা গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলিকেই

আধা-আইনি এবং কখনও সম্পূর্ণ গোপন করে কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু, বাস্তবে প্রত্যক্ষভাবে সাংগঠনিক এলাকার সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল বিশাল। হাজার লক্ষ শ্রমিক এর নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হয়। প্রথম আন্তর্জাতিক সামাজিক- অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণিকে একটি সাধারণ মঞ্চে সামিল করতে সমর্থ হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির চূড়ান্ত মুক্তির প্রশ্নে এই মঞ্চ ছিল প্রথম ধাপ। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টির পেছনে প্রথম আন্তর্জাতিকের অবদান অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের ধরন এবং নেতৃত্বের মান ইত্যাদি বিষয়গুলি এর নেতৃত্বেই আরো উন্নত হয়। প্যারী কমিউনের ফরাসী শ্রমিকশ্রেণির বৈজ্ঞানিক সমাজতত্বের কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণিকে মার্কস্‌বাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চেতনায় সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা পালন করেছিল। এই চেতনাকে ভিত্তি করেই শ্রমিকশ্রেণি ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, শ্রমজীবী তথা শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ইউরোপের ধর্মঘট চলাকালীন এই ধর্মঘটগুলিকে ভাঙার জন্য বাইরের দেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকভাবেই এই সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কতগুলি সাধারণ মিল রয়েছে, তারই ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রমজীবীদের মধ্যে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছিল।

আন্তর্জাতিক পুঁজিকে প্রতিহত করা, একচেটিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক জোট বাঁধা, বেড়ে চলা সামরিক তৎপরতা,সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধ,উপনিবেশগুলির সম্পদ লুটে নেবার ক্রমবর্ধমান

প্রবণতা, জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলি মোকাবিলা করার দায় ঐতিহাসিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণির উপর পড়েছিল। বিশেষ করে শ্রমিক-শ্রেণির ঐক্য ভাঙ্গার জন্য এবং তাদের দমন করার জন্য উগ্র জাতীয়তাকে পুঁজিবাদী দেশগুলি বেশি করে ব্যবহার করে।

এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বৃহত্তর শ্রমিক সংহতি গড়ে তোলা আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবীদের সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৯১৪ সাল সময়ের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, যুব এবং অন্যান্য সর্বহারাদের সংগঠনগুলিসহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ও তাদের সমর্থক ও সদস্য সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং সর্বহারাদের যে সমস্ত নতুন কাজ ও পরিপ্রেক্ষিত মোকাবিলা করতে হচ্ছে এই অবস্থায় সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, শ্রমজীবীদের আন্দোলন সংগ্রামের বিস্তারে, একে শক্তিশালী করতে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীদের মধ্যে ঢিলেঢালা যোগসূত্রকে উন্নত করতে মার্কসবাদের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আন্তর্জাতিককে আবার নূতন করে গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভিত্তি স্থাপন

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম আন্তর্জাতিককে ভেঙ্গে দেওয়া হয় ১৮৭৬ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে। তার ১৩ বছর পর ১৮৮৯ সালে আবির্ভাব ঘটে নতুন আন্তর্জাতিকের। ইতিহাসে এই নতুন আন্তর্জাতিকই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নামে খ্যাত। প্রথম আন্তর্জাতিক টিকে ছিল ১২ বছর (১৮৬৮-১৮৭৬)। আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক টিকে ছিল ২৫ বছর (১৮৮৯-১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধই ডেকে এনেছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন।

প্রথম আন্তর্জাতিক ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যবর্তী সময়ে মার্কসবাদের সাধারণ ভিত্তিতেই ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এবং ইউরোপেরও বাইরে কয়েকটি দেশে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক বা সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। এই

পার্টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রথম আন্তর্জাতিকই প্রস্তুত করেছিল। প্রথম আন্তর্জাতিকের বার বছরের জীবনকালে তার অভ্যন্তরেই বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলেছিল তার ফলে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ও রণকৌশল স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল এবং মার্কসবাদের প্রাধান্যই ঘোষিত হয়েছিল। ফলে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

তাছাড়া এই তের বছর শ্রমিক আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটেছিল। বিরাট ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, গড়ে তুলেছিল নিজেদের বিরাট বিরাট ইউনিয়ন। এই চিত্র বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সে, জার্মানীতে, বেলজিয়ামে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ডে এবং রাশিয়ায়। মার্কসীয় মতবাদ তখন সারা দুনিয়ায় প্রসারিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এঙ্গেলসের কথায়, " আজ সারা পৃথিবীর সব সভ্য দেশে সে মতবাদের অসংখ্য অনুগামী মিলবে, মিলবে যেমন সাইবেরিয়ার খনিতে দন্ডিত বন্দীদের মধ্যে, তেমনি ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনির মজুরদের মধ্যে। আর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা স্বকালে যিনি ছিলেন সর্বাধিক ঘৃণিত, সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তি, সেই কার্ল মার্কস জীবনের অবসানকালে হয়ে ওঠেন পুরোনো ও নতুন, উভয় দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের কাছেই চিরবাঞ্ছিত ও সদা প্রস্তুত পরামর্শদাতা।"

এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের শেষের দিকে এটাই প্রতিভাত হলো যে মার্কসবাদের মূলনীতির সাধারণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে নতুনভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। ১৮৮৩ এবং ১৮৮৬ সালের মধ্যে প্যারিসে দু'টি আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন শ্রমিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার এসেছে। সর্বত্রই তখন শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

ইতোমধ্যে ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে সোস্যালিস্ট সংগঠনগুলিকে বাদ দেওয়া হলো। ঐ সম্মেলনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হলো যে, সোস্যালিস্ট সংগঠনগুলিকে বাদ দিয়েই একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তারজন্য ১৮৮৯ সালে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক

শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বানেরও সিদ্ধান্ত হলো।

এই ঘটনায় এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মার্কসবাদীদের আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট সংগঠন গড়ার সময় হয়েছে এবং এখন আর দেরি করা উচিত নয়। তাই মার্কসীয় পার্টিগুলো সোস্যালিস্ট সংগঠন সমেত একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করল। ১৬টি দেশের মার্কসীয় সোস্যালিস্ট পার্টির নেতারা উদ্যোগ নিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে, ফরাসী দেশের বাস্তিল দুর্গের পতনের শতবার্ষিকী দিবসে ১৮৮৯ সালে ১৪ই জুলাই প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। এভাবেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হলো।

এখানে উল্লেখ্য, লন্ডন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত ১৮৮৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোস্যালিস্টদের বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্যে প্যারিসেই ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস আহূত হয়েছিল। আর মার্কসীয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলোও ১৮৮৯ সালেই প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করলো। একটি হলো মার্কসবাদ-বিরোধী সম্মেলন, আরেকটি হলো মার্কসবাদী চিন্তাধারায় পরিচালিত সম্মেলন। এই দু'টোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা কেউ কেউ করেছিলেন।

কিন্তু এঙ্গেলস এই ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং জরগের কাছে লেখা এক চিঠিতে (১৭ জুলাই ১৮৮৯) তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, শ্রমিকেরা নিজেরাই দেখুক, কোনটা প্রকৃত আন্দোলনের প্রতিনিধি, আর কোনটা নিছক প্রতারণা ঃ ঐক্যের মিথ্যা বুলির চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে " কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক" সম্বন্ধে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেন, "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক টিকে ছিল ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত। সে যুগ ছিল ধনতন্ত্রের সবচেয়ে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ, বড় বড় বিপ্লব-বর্জিত যুগ। সেই যুগে কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু অধিকাংশ পার্টিতেই শ্রমিক নেতারা এই শান্তির যুগের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ফলে বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯১৪

সালে শুরু হলো এমন এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধ চার বছর ধরে পৃথিবীর মাটি রক্তে রঞ্জিত করে দিল। এই যুদ্ধ চলেছিল ধনীদের মধ্যে মুনাফার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে, ছোট ছোট এবং দুর্বল জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব নিয়ে। এ যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ঐসব সোস্যালিস্টরা তাদের নিজ নিজ সরকারের পক্ষে এসে দাঁড়ালো। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো শ্রমিকদের প্রতি, এই হত্যাভিযান দীর্ঘস্থায়ী করতে তারা সাহায্য করলো; তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা ধনীকদের শিবিরেই যোগ দিল।"

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে লেনিন এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন — " দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪) ছিল প্রলেতারীয় আন্দোলনের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন--- সাময়িকভাবে বিপ্লবী মান নিচুতে নামিয়ে দিয়ে সাময়িকভাবে সুবিধাবাদের শক্তি বৃদ্ধি করেই এই সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং এরজন্য পরিশেষে এই আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর পতন ঘটল।"

লেনিনের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজের ধারা ও পতনের মূল কারণ, যার বিস্তৃত বিবরণ আমরা দেখবো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসগুলির কাজের মধ্যে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম কংগ্রেস

১৪-১৯ শে জুলাই ১৮৮৯ সাল। প্যারিসে অভূতপূর্ব বিপ্লবী উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস অর্থাৎ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। ২০টি দেশের প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে এসেছিলেন চারজন প্রতিনিধি। যে হলে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো, সেই হলে রক্ত পতাকার মধ্যে লেখা ছিল, " সকল দেশের প্রলেতারিয়েতরা এক হও, এসো আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।" সম্মেলন হলের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একটি অপূর্ব স্লোগান ঃ "পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্ছেদ চাই! উৎপাদনের উপায়ের সমাজীকরণ চাই!"

এই কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন প্যারি কমিউনের সদস্য ভায়ান,

আর প্রখ্যাত সোস্যালিস্ট নেতা লিবেনখট্। এই কংগ্রেসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল মে দিবসকে শ্রমিকশ্রেণির শক্তির আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি হিসাবে, শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতির নিদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

১৮৯১ সালের ৩-৭ই আগস্ট ব্রাসেলসে দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হলো যে যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণিকে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং নিজেদের আন্তর্জাতিক সংগঠন সুদৃঢ় করতে হবে।

তৃতীয় কংগ্রেস

তৃতীয় কংগ্রেস হয় ১৮৯৩ সালের ৯-১৩ আগস্ট জুরিখে। এই কংগ্রেসেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতেই নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের সোস্যালিস্টকদের পার্থক্যের সীমারেখা টানা হয়। যদিও এই প্রস্তাবের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা ছিল, তবু এই প্রস্তাবেই নৈরাজ্যবাদীদের মূলনীতির উপর প্রচন্ড আঘাত হানা হয় এবং নৈরাজ্যবাদীরা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করে। এই কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ দেন এঙ্গেলস্। তিনি তাঁর ভাষণে সাংগঠনিক ব্যাপারে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তার উপরই বিশেষ জোর দেন।

চতুর্থ কংগ্রেস

চতুর্থ কংগ্রেস ১৮৯৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেসে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তৃতীয় কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা দূর করে একে উন্নত করা হয়। এই চতুর্থ কংগ্রেসেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রবেশের যে শর্ত গৃহীত হয়, তাতে পরিষ্কারভাবেই একথা বলা হয় যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রস্তাব যারা মানবে না, তারা

আন্তর্জাতিকের সদস্য থাকতে পারবে না। এই শর্ত নৈরাজ্যবাদীরা মানতে অস্বীকার করল ফলে আন্তর্জাতিক থেকে তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হলো।

এই তিনটি কংগ্রেসেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য শ্রমিকশ্রেণির কাছে আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে চলছিল ব্যাপক সমরসজ্জা, চলছিল দুনিয়ার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে কলহ এবং দুনিয়ার বুকে নেমে আসছিল যুদ্ধেরই বিপদ। ব্রাসেলস কংগ্রেসে (১৮৯১) ঘোষণা করা হলো যে, যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণিকে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং নিজেদের আন্তর্জাতিক সংগঠন সুদৃঢ় করতে হবে। জুরিখ কংগ্রেসে (১৮৯৩) এই প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটি ধারা যোগ করে বলা হলো— শ্রমিকশ্রেণিকে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের দাবি নিয়ে লড়তে হবে এবং পার্লামেন্টে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের যুদ্ধ-বাজেটের বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে। লন্ডন কংগ্রেসে (১৮৯৬) স্থায়ী ফৌজ ভেঙ্গে দেবার এবং জনগণকে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত করার দাবি জানানো হলো।

পঞ্চম কংগ্রেস

পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯৯০ সালের ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর, প্যারিসে। ১৮৭০ থেকে ১৯০০— এই যুগটিকে বলা হয়ে থাকে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের যুগ। আর ১৯০০ সাল থেকে যে যুগের সূচনা, সে যুগে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী যুগটা বেশ ভালভাবেই শুরু হয়ে গেছে। ধনতন্ত্রের উর্দ্ধগতি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের এই যুগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির সোস্যালিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের চরম অভিব্যক্তি দেখা দেয়। পঞ্চম কংগ্রেসে এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদে মিলেরাঁবাদ রূপে তুমুল বিতর্কের সূচনা করে।

পঞ্চম কংগ্রেসে যুদ্ধ এবং উপনিবেশবাদ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে বিপ্লবী মার্কসবাদীদের এই বক্তব্য ব্যক্ত হল। এই কংগ্রেসে যুদ্ধ সম্পর্কে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রোজা লুক্সেমবুর্গ। যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা প্রস্তাবে ঘোষিত হয়, তা হল, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুবকদের শিক্ষিত

করে তুলতে হবে এবং তাদের সংগঠিত করতে হবে। পার্লামেন্টে সোস্যালিস্টদের সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে এবং যদি আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দেয় তাহলে একই সময়ে সকল দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হল যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক কর্মনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে এবং উনিবেশগুলিতে সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করতে হবে।

এই কংগ্রেসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই এগার বছরের জীবন-ইতিহাসে কোনো কেন্দ্রীয় দফতর ছিল না। এই কংগ্রেসে একটি কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তার নাম দেওয়া হয় ইন্টারন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ব্যুরো এবং এর দফতর স্থাপিত হয় বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। কিন্তু এই দফতর এমনভাবে গঠিত হলো যে, এর কাজ হলো শুধু বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা, পরিসংখ্যান সরবরাহ করা। প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলের যেমন একটা নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই নব গঠিত ব্যুরোর সেরকম কোন ভূমিকাই ছিল না। কার্যত এই ব্যুরো একটি 'পোষ্ট অফিস' হিসেবেই কাজ করেছে।

ষষ্ঠ কংগ্রেস

১৪-২০ শে আগস্ট, ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় আমস্টারডামে। এই কংগ্রেস ছিল এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইনের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কংগ্রেস। বার্ণস্টাইন সংশোধনবাদের জনক। তিনি ছিলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য।

আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেসে তত্ত্ব হিসাবে সংশোধনবাদকে নিন্দা করা হয় এবং মার্কসবাদই যে আন্তর্জাতিকের তত্ত্ব, তা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংশোধনবাদ অধিকাংশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে বিরাজ করতে থাকে এবং সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে অর্থাৎ ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধ বিপ্লবী মার্কসবাদীদের প্রচন্ড মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয় এবং সেই বিপ্লবী মার্কসবাদীদের নেতা ছিলেন কমরেড লেনিন।

সপ্তম কংগ্রেস

সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় জার্মানির স্টুটগার্ডে, ১৯০৭ সালের ১৮-২৪ শে আগস্ট। ৫০ হাজার শ্রমিকের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এই কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। কংগ্রেস প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয় যে, বহু দেশে শ্রমিকদের সংগঠন-পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ ইত্যাদি দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। এটা ঘটনা যে ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯০৪ সাল) পর রুশ দেশে ঘটল ১৯০৫ সালের বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস বসে স্টুর্টগার্ড। তাই রুশ দেশের শ্রমিকদের বীরত্বের প্রশংসা করা হলো এবং তাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হলো। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হলো, রুশ বিপ্লবের শিক্ষা নিয়ে কোন আলোচনা এই কংগ্রেসে হয়নি।

তবে এই কংগ্রেসে উপনিবেশবাদ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং সংশোধনবাদীদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানা হয়েছে। ডাচ প্রতিনিধি ভানকলের নেতৃত্বে এবং বার্ণস্টাইনের সমর্থনে কংগ্রেসের উপনিবেশ কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা পূর্বেকার কংগ্রেসের উপনিবেশবাদ-বিরোধী প্রস্তাবের নিন্দা করলেন এবং "সমাজতন্ত্রী ঔপনিবেশিক কর্মনীতি" বলে এক নয়া নীতি জাহির করলেন। এই কর্মনীতি ব্যাখ্যা করে তাঁরা যা বললেন তার মানে হলো, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। অর্থাৎ এই কর্মনীতি উপনিবেশবাদের কাছে আত্মসমর্পন ছাড়া আর কিছু নয়।

সংশোধনবাদীদের এই কর্মনীতির বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরা প্রচন্ড সংগ্রাম করলেন এবং কমিশনে যদিও তাঁরা সংখ্যালঘু ছিলেন তা সত্ত্বেও তাঁদের এই মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে তাঁরা জয়ী হলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপনিবেশবাদের নিন্দা করে তাঁরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তা ১২৭-১০৮ ভেটে গৃহীত হলো। সংশোধনবাদীরা উপনিবেশবাদের সভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যে প্রস্তাব এনেছিল তা পরাজিত

হলো।

স্টুটগার্ড কংগ্রেসে আর যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচিত হলো তা হচ্ছে আসন্ন ইউরোপীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সমরবাদের বিরুদ্ধে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন এবং যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তা হলে যুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য কি হবে, তা নির্ধারণের প্রশ্নে। এই কংগ্রেসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে চারটি প্রস্তাব আসে। তার মধ্যে তিনটিই আসে ফরাসী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে, আর একটি আসে জার্মান প্রতিনিধি বেবেলের কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে বেবেলের প্রস্তাবটিই ছিল মূল প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক মার্কসীয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছিল।

কিন্তু যুদ্ধ বাধার পর বিপদ দেখা দিলে কি করা হবে এবং যুদ্ধ বাধলেই বা কি করা হবে সে সম্পর্কে এ প্রস্তাবে কর্মধারার কোনো সঠিক নির্দেশ ছিল না। এই নির্দেশ এলো লেনিন আর রোজা লুক্সেমবুর্গ রচিত সংশোধনীতে। লেনিন-লুক্সেমবুর্গ সংশোধনী প্রস্তাবই বেবেলের প্রস্তাবের দ্ব্যর্থবোধক রূপ পরিবর্তন করে তাকে বিপ্লবী রূপ দান করল।

যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাব রচনার সাব- কমিটিতে রোজা লুক্সেমবুর্গ ছিলেন। লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি সাব-কমিটিতে ঐ সংশোধনী পেশ করেন। আসলে এই সংশোধনী লেনিনেরই রচনা। মূল প্রস্তাবের শেষে দু'টি প্যারাগ্রাফ যোগ করে দিয়ে লেনিন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধে সোস্যলিস্টদের কর্তব্য কি, তা-ই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন।

মনে রাখা দরকার যে, যুদ্ধ বলতে এখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই বোঝাচ্ছে। সংশোধনী প্রস্তাবের সারমর্ম হলো যে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে, পুঁজিবাদী শ্রেণির শাসনের পতন ঘটিয়েই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদকে, সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে হবে। লেনিন ঘোষণা করলেন যে, প্রলেতারীয় বিপ্লব দিয়েই শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সফলভাবে প্রতিহত করা যেতে পারে। কংগ্রেসে এই সংশোধনীর সমর্থনে বক্তৃতা দিতে উঠে রোজা লুক্সেমবুর্গ বললেন যে, " যুদ্ধ বাধলে কেবলমাত্র যুদ্ধবসানের জন্য নয়, সাধারণভাবে শ্রেণি শাসনের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে ব্যবহার

করার জন্য প্রচারভিযান চালাতে হবে।" এইভাবেই লেনিন- লুক্সেমবুর্গ সংশোধনী সহ বেবেলের প্রস্তাব কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯০৭ সালের ষ্টুটগার্ড কংগ্রেস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী এবং কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। বলা যায় সেই কংগ্রেসের আদর্শগত ও রাজনৈতিক মান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন, এই কংগ্রেস দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে চূড়ান্তভাবে সংহত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিকের পরবর্তী কংগ্রেসগুলিকে সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক কর্মধারার প্রকৃতি ও গতিপথ নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। চূড়ান্ত নিয়মাবলীতে জরুরি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ, উৎপাদনের উপকরণের সমাজীকরণ ও তার বিনিময়, শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি, তার কর্মধারায় শ্রেণিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ সর্বহারা কর্তৃক প্রশাসনের ক্ষমতা দখল করা ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত করা হয়। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়নগুলি, যারা রাজনৈতিক কর্মসূচীর সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও যদি এই কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তবে তারাও এই আন্তর্জাতিকে যুক্ত হতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯০৭ এর কংগ্রেস সদস্য দেশগুলির মধ্যে ভোট ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সদস্য সংখ্যা এবং দেশের গুরুত্ব, সমাজতান্ত্রিক দলটির রাজনৈতিক প্রভাব এবং অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহের শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রত্যেক সদস্য দেশ বা সংগঠন ২ থেকে ২০ ভোট ক্ষমতা পাবে বলে স্থির হয়। সেই নিরিখে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া (চেকসহ) ফরাসী, রাশিয়া এবং ব্রিটিশ সদস্য দেশগুলি প্রত্যেকে ২০ ভোট, ইতালী ১৫, আমেরিকা ১৪, বেলজিয়াম ১২, ডেনমার্ক, পোলান্ড ও সুইজারল্যান্ড ৮, স্পেন, হাঙ্গেরী ও নরওয়ে ৬,বাকীরা ৪ এবং লুক্সসেমবুর্গ ২ ভোট ক্ষমতা পাবে। সামান্য পরিবর্তন ছাড়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুরো সময় এই নিয়মই মেনে চলা হয়।

ষ্টুটগার্ড কংগ্রেসেই ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়গুলির শ্রেণিসংগ্রামে তাদের অবস্থান, শ্রমিকশ্রেণির পার্টির সাথে সম্পর্ক গড়া কিংবা নিরপেক্ষ অবস্থান দেবার উপর বিভিন্ন খসড়া প্রস্তাব নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক হয়। অবশেষে সমঝোতা হিসাবে

ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলা হয়। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন তখনই সর্বহারার মুক্তির সংগ্রামে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবে, যখন তারা তাদের সমস্ত কার্যক্রম সমাজতান্ত্রিক চেতনার মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারবে।

ষ্টুটগার্ডের সপ্তম কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয় জরুরি দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। জরুরি দাবিগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষ করে সার্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদি। এই কংগ্রেসেই মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে মতপার্থক্য গড়ে ওঠে। অষ্ট্রিয়ার একজন প্রতিনিধি এবং কিছু ব্রিটিশ ও অন্যান্য প্রতিনিধি মহিলাদের আংশিক ভোটাধিকারের পক্ষে মত দেন। শুধু তাই নয়, তারা সার্বজনীন ভোটাধিকারেরও বিরোধিতা করেন। কিন্তু ক্লারা জেটকিনসহ অন্যান্য বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে সুবিধাবাদীদের বিকল্প প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ক্লারা জেটকিন অন্যান্য বিষয়ের সাথে তাঁর বক্তব্যে ১৯০৫-র রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন, " সর্বহারা নারীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বিপ্লবের সাফল্য অসম্ভব। শ্রেণিসংগ্রামে মহিলাদের ভোটাধিকার পাওয়া, লক্ষ্যের প্রান্তে পৌঁছানোর প্রশ্নে আমাদের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।"

এই কংগ্রেসে শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা নির্ধারণ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেসে ৮ ঘন্টা কাজের সময়, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, শ্রমিক নিরাপত্তা সম্পর্কে শ্রমিক ও মালিকের যৌথ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়।

অষ্টম কংগ্রেস

অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো কোপেনহেগেনে ১৯১০ সালের ২৮ শে আগস্ট- ৩রা সেপ্টেম্বর। যুদ্ধের বিপদ তখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কংগ্রেসে শান্তি বজায় রাখার সাধারণ প্রস্তাবের সঙ্গে স্টুটগার্ড কংগ্রেসের যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবের মূল কথাগুলিই আবার ঘোষিত হলো। সংস্কারপন্থীরা এই কংগ্রেসে সার্বভৌমত্বের নামে শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলি কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তাদের

নিজ নিজ প্রভাবের এলাকায় কখন এবং কিভাবে রূপায়িত করা হবে এই বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে বলে ভোটাধিক্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়। ফলে আন্তর্জাতিকের বাঁধন লঘু হয়ে পড়ে।

এই কংগ্রেসেই সিদ্ধান্ত হলো যে, পরবর্তী কংগ্রেস অর্থাৎ নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ভিয়েনাতে এবং সেই কংগ্রেসেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হবে।

নবম কংগ্রেস

২৪-২৫ নভেম্বর বাসলেতে নবম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠায় এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসায় শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরো ১৯১২ সালের বাসলেতে একটি বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেসেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য এক ইস্তেহারে শ্রমিকশ্রেণির কাছে এবং সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির কাছে আহ্বান জানানো হলো। এই ইস্তেহারই বাসলে ইস্তেহার নামে খ্যাত। ইস্তেহারে আসন্ন যুদ্ধকে লুণ্ঠনবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে শ্রমিক শ্রেণির সাথে এই যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই বলে বক্তব্য রাখা হয়। বলা হয়, সমাজতান্ত্রিকরা পুঁজিবাদের বিশ্বশোষণ এবং গণনিধনের তীব্র বিরোধিতা করে। এই কংগ্রেসেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, পরবর্তী কংগ্রেস হবে ভিয়েনায় ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে।

আন্তর্জাতিকের পতন

কিন্তু ১৯১৪ সালে যেই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো অমনি যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি বাসলে ইসতেহারে ঘোষিত নীতিকে বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধবাজ সরকারের পিছনে এসে সামিল হলো। "পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার" স্লোগান তুলল এবং কোনো কোনো পার্টি আবার বাসলে ইস্তেহারের মূল বক্তব্যের বিকৃতিও করল। আসলে তারা সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল।

দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা মার্কসবাদের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। ফলে শব্দাবলী, বক্তব্য এবং

প্রস্তাবের সাথে তাকে রূপায়িত করার কাজে অস্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কেন্দ্রিকতাবাদীদের বাধা দানের ফলে এবং বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের একটা অংশের মধ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাবে, নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উদ্ভূত হয়েছে, সেই সম্পর্কে কোন ব্যাপক ও মার্কসবাদী পথে সেগুলির সমাধান করতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ব্যর্থ হয়। শ্রমিকশ্রেণিকে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য বিপ্লবের ধরণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কেও কোন নির্দেশিকা দিতে পারেনি। শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলির পুনর্গঠনের কোন নূতন পদ্ধতি অথবা তাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই-এর সামর্থ বাড়াবার জন্য কোন রূপরেখা রচনা করা যায়নি। এমনকি সর্বহারারা কিভাবে অন্যান্য সহযোগীদের সমর্থন করতে সমর্থ হবে তাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

সুবিধাবাদীরা আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ব্যুরোকে অচল করে দেয় এবং সমাজতান্ত্রিক কার্য রূপায়ণকারী কমিশনের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, বিশেষ করে, ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গভীর সংকটে পড়ে। সংস্কারবাদী ও কেন্দ্রিকতাবাদীরা মেলিগন্যান্ট টিউমারের মতো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে নেতৃত্বদানকারী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতো একটি জীবন্ত এবং ক্রমবর্দ্ধমান দেহকে অচল করে দিল। পরিশেষে ১৯১৪ সালে ব্রাসেলসে কংগ্রেসের ব্যুরোর বিশেষ অধিবেশনের পরই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তা সত্ত্বেও ১লা মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে ও ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা এবং কাজের ঘণ্টার সময়সীমা ৮ ঘন্টা করার জন্য আন্তর্জাতিকস্তরে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে বলশেভিকসহ বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীদের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সমর্থনে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আপোষকামী ভূমিকাকে তুলে

ধরতে সাহায্য করেছে, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে নূতনভাবে ঢেলে সাজাতে সহায়তা দান করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্কটের আবর্তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন ঘটায় সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সেদিন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তারা ভেবেছিল যে, এই মহাযুদ্ধের মধ্যেই মার্কসবাদের সমাধি রচিত হবে। কিন্তু তারা ভুল করেছিল। সেদিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন ঘটেছিল সত্য, কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের, মার্কসবাদের সমাধি ঘটেনি। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যারা গোড়াপত্তন করবে, যারা বিপ্লবী মার্কসবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, শুরু করবে প্রলেতারিয় বিপ্লবের বিজয় অভিযান, সে শক্তি সেদিন ইউরোপের ভূখন্ডে ছিল। আর সেই শক্তির কেন্দ্রে যিনি সেদিন বিরাজ করেছিলেন তিনি হলেন লেনিন। লেনিনের নেতৃত্বেই গঠিত হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক

পুঁজিবাদী সংকটের গভীরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ১৯১৭ এর অক্টোবর বিপ্লব। এই সংকটের শুরু প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়। লেনিন পুঁজিবাদের সংকটের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আগেই যে কথা বলেছিলেন অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের এই অতুলনীয় সংকট গভীরতর হয়েছে', তাও সত্যে পরিণত হয়েছে।

এই সংকট শুধু পুঁজিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্ব বিপ্লবী কর্মকান্ডের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। কারণ, এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বহারাসহ অবদমিত জাতির বিপ্লবী কার্যকলাপকে নেতৃত্ব দেয়া বা পুরোনো বিশ্ব ব্যবস্থাকে ভেঙে যে নূতন ব্যবস্থার জন্ম হচ্ছে তাকে কাজে লাগাবার মতো শ্রমজীবীদের কোন নেতা পৃথিবীর অনেক দেশেই ছিল না। শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী কর্মকান্ড আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা। ভেঙে যাওয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ পার্টি, যারা যুদ্ধের সময় সামাজিক উগ্রজাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করেছিল, তারা একদিকে

সর্বহারাদের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল শুধু নয় তারা সর্বহারাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়া এবং তাদের নিজ নিজ দেশের সর্বহারাদের বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মেরও বিরোধিতা করতে থাকে। যুদ্ধের আগেই বেশিরভাগ পার্টির উচ্চ নেতৃত্বের এ ধরণের সংস্কারবাদী ভূমিকা বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল এবং ভাঙন ধরাতে সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় এবং রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকল্প নূতন এক ব্যবস্থার জন্ম, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, তার মধ্যে সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায়, তা প্রমাণ করলো। মধ্য ইউরোপ জুড়ে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং সেখানকার বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। সেই দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণি প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলো। শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সে সব দেশের শাসকশ্রেণি বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও সুবিধাদানে স্বীকৃত হলো।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবের ঝোঁককে মোকাবিলা করার জন্য দমন পীড়নের নীতি গ্রহণ করলো। অন্যদিকে ইউরোপের এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন সামাজিক সংস্কারপন্থীরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার জন্য কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেনি। বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণের নীতি অনুসরণ করে চলেন।

লেনিন ইউরোপের বিপ্লবের এই অগ্রগতিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এটাও লক্ষ্য করেন যে, বিপ্লবের শুরুতে ইউরোপীয় শাসকরা তাদের দেশের জনসাধারণের কাছে শাসিতশ্রেণির একনায়কত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র আড়াল করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

সংস্কারপন্থীরা জনগণের এই বিপ্লবী চেতনার সৃজনকে বাধা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথে তারা বিপ্লবের প্রতিরোধের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। উদ্দেশ্য , দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিকের আদলে সামাজিক সংস্কারপন্থীদের একটা মঞ্চ গড়ে তোলা। কিন্তু তা প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকের চরিত্র পেতে পারেনা। কারণ,

লেনিনের ভাষায়, " ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্লোগানও বটে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি চায় মার্কসবাদীদের ঐক্য। মার্কসবাদী এবং সুবিধাবাদী ও মার্কসবাদের বিকৃতকারীদের মধ্যে ঐক্য নয়।" তবুও বৃটিশ লেবার পার্টির নেতৃত্ব প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মতো একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। সামাজিক সংস্কারবাদী, কেন্দ্রিকতাপন্থীদের উদ্যোগে ১৯১৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সুইজারল্যান্ডের বার্ণেতে " শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদের একটি সম্মেলন এবং তার দুই দিন বাদে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ২৬টি দেশের ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এরা বেশিরভাগই দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধি ছিল। এদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিপ্লবী রাশিয়ার নিন্দা করা এবং ফরাসী, বৃটিশ ও ইতালীর সর্বহারাদের বিপ্লবী কাজকর্মকে স্থবির করে দেয়া।

কিন্তু ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন অভ্যুত্থান ও সেগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পার্টির ভূমিকা একথা প্রমাণ করে যে পুরোনো সোস্যাল - ডেমোক্র্যাটিক পাটিগুলি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এমনকি তা নূতনভাবে গড়ে তুললেও উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং যে বিপ্লবী উন্মেষ ঘটে চলছে তার সুযোগকে কাজে লাগাতে অসমর্থ। একমাত্র নূতন ধরণের সর্বহারাদের পার্টি, যা সমস্ত রকম সুবিধাবাদ এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রভাবমুক্ত, যা বিপ্লবী মার্কসবাদের আদর্শে ও জঙ্গী আন্তর্জাতিক সংহতিবোধ দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, একমাত্র সে ধরণের পার্টিই সামাজিক সম্পর্কের বিপ্লবী পরিবর্তনের দাবিতে এগিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ। লেনিন এবং তাঁর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব তাঁদের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যুর সময়ই এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের বিপ্লবীরা এই সত্য অনেক দেরিতে উপলব্ধি করেন। ইউরোপের বিপ্লবের প্রথম মাসেই তারা স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং একটা নূতন ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার প্রকৃত সময়ও সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধের ফলে বিভক্ত এবং জঙ্গীবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণিকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ঐক্যে সংহত করার জন্যও একটি

নূতন আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন ছিল। একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশের দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিপ্লবী গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করবে। রুশ বিপ্লবের বিজয়ের মাধ্যমে রাশিয়াতে সর্বহারার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থা মস্কোতে একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলাকে সম্ভব করে। মস্কোতে এই কারণে যে, এখান থেকে বিভিন্ন দেশের এবং জাতির সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা অধিকতর সহজসাধ্য হবে।

১৯১৭ এর শেষ দিকে বলশেভিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী, যারা রাশিয়ার সরকারের নীতিকে সমর্থন করে এবং নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ, সে ধরণের পার্টিগুলিকে নিয়ে একটি সম্মেলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ইউরোপে জার্মানীসহ কয়েকটি দেশে শাসকদের সামরিক তৎপরতা এবং গৃহযুদ্ধের কারণে তা স্থগিত রাখা হয়।

১৯১৮ সালে ডিসেম্বরের শেষদিকে লেনিন এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, এক সময় রাশিয়াতে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী কাজকর্মকে " মুষ্টিমেয় পাগল মানুষের" কাজ বলে মনে করা হত, কিন্তু বর্তমানে বিগত এক বছর ধরে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীতেও তা হওয়া সম্ভব, বিশেষত সেখানে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সেই সময় লেনিন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের সংগঠনের একটি রূপ রেখাও তেরি করেন। লেনিন মনে করেন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকে শুধুমাত্র ইতোমধ্যে গড়ে উঠা কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, যে সমস্ত পার্টি ও গোষ্ঠী বলশেভিকবাদকে সমর্থন করে এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদেরও এর সাথে যুক্ত করা হবে।শুধু তাই নয় পূর্বতন কংগ্রেসের যে সমস্ত সদস্য যারা "সামাজিক দেশভক্ত" দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, যারা এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে, যারা সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাস করেন, যারা বিশ্বাস করেন বুর্জোয়া

সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের কাজকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা আছে এবং যারা মনে করে যে, সোভিয়েত ধরণের সরকার অন্যান্য সরকারের চেয়ে উচ্চতর ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সহায়ক, তাদেরও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই পরিকল্পনা একথাই প্রমাণ করে যে, লেনিন বিপ্লবী মার্কসবাদের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত অগ্রগামী অংশকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠন করার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। লেনিনের কথায় " সুবিধাবাদ ও জাতিদাম্ভিক সমাজবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রামের ফলে যখন কতকগুলি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলো তখনই প্রকৃতপক্ষে ১৯১৮ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আবির্ভাব ঘটল।"

নভেম্বর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় যখন শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, লেনিন তখন এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরই উদ্যোগে কয়েকটি দেশের সোস্যালিস্ট পার্টির বামপন্থী গ্রুপগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত করা হলো যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস শীঘ্রই আহ্বান করা হবে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে লেনিন আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রমিকদের নিকট তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের আহ্বান জানালেন।

প্রথম কংগ্রেস

১৯১৯ সালের ২রা মার্চ মস্কোর ক্রেমলিনে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সম্মেলন শুরু হয়। প্রথম দিকে কিছু বাধা বিপত্তি এবং জার্মান প্রতিনিধিদের দাবি অনুযায়ী ৪ঠা মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লেনিন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই সম্মেলনকে উদ্দেশ্য করে বলেন "আমাদের এই একত্রে সমবেত হওয়ার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছে।" কারণ, তিনি আরও বলেন যে "বিশ্ব জুড়ে বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং তার তীব্রতা বাড়ছে"। সম্মেলন পরিচালনার জন্য লেনিন,জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

হিউগো এবারলেইন এবং সুইস কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রিল প্ল্যাটার্নকে নিয়ে একটি সভাপতিমন্ডলী নির্বাচিত হয়।

বলশেভিক পার্টি এবং সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ছাড়া ইউরোপের ছয়টি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং সাথে সাথে পশ্চিমের অধিকাংশ দেশে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী অথবা কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠে। পঁয়ত্রিশটি সংগঠনের বাহান্নজন প্রতিনিধি (১৯টি ভোটের অধিকারী এবং ১৬টি পরামর্শ পর্যায়ের) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান।

এই কংগ্রেসে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলিল তৈরি হয়। একটি হলো কমিনটার্ণের ম্যানিফেস্টো। মার্কসবাদের মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত কমিনটার্ণের ম্যানিফেস্টোর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল লেনিনেরই বিপ্লবী চিন্তাধারা। বিশেষ করে, তাঁর " সাম্রাজ্যবাদ—ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর" এবং "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে তিনি যে তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন — এসবই সংক্ষেপে ব্যক্ত রয়েছে এই ম্যানিফেস্টোতে।

এই কংগ্রেসের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলিল হলো " বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব" শীর্ষক থিসিস। এই থিসিসে লেনিন শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব আর শোষকশ্রেণিগুলির একনায়কত্বের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান তা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, সমাজের অতি সামান্য একটি অংশের স্বার্থরক্ষার জন্য মেহনতী জনগণের প্রতিরোধকে বল প্রয়োগ করে দাবিয়ে দেওয়াই হলো শোষকশ্রেণিগুলির একনায়কত্বের লক্ষ্য। আর সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং কমিউনিজম গড়ে তোলার জন্য শোষকদের প্রতিরোধকে বল প্রয়োগে দাবিয়ে দেওয়াই হলো শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের লক্ষ্য। তিনি ঘোষণা করলেন, সমগ্র মেহনতী জনগণের জন্যই একান্তভাবে প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের। কেননা শুধু এই একনায়কত্বের মধ্যদিয়ে মানবজাতি কমিউনিজমের দিকে, শোষণহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তিনি দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের রাজনৈতিক রূপ হলো সোভিয়েত— সোভিয়েত শাসনই মেহনতী জনগণের জীবনে এনে দিয়েছে প্রকৃত গণতন্ত্র। ***লেনিনের এই থিসিসই কমিউনিস্ট***

আন্তর্জাতিকের কর্মসূচীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়ালো।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯২০ সালে। এই কংগ্রেসের প্রধান প্রধান প্রস্তাব লেনিন রচনা করলেন। এই সব প্রস্তাবে তিনি বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন শিক্ষাই কমিউনিস্টদের সামনে তুলে ধরলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করার,কাজ করার প্রশ্নটি।

প্রথম কংগ্রেসও দ্বিতীয় কংগ্রেসের মধ্যবর্তী কালে লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য নির্ধারণপ্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এবং তা হবে ব্যতিক্রম) কোনো অবস্থাতেই পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ও কাজকে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চলবে না। সেগুলিকে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামের উপজাত হিসাবেই শুধু দেখতে হবে।"

এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের করণীয় কাজ সম্পর্কে থিসিস, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে, সে সম্পর্কে থিসিস লেনিন এই কংগ্রেসেই উত্থাপন করলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এক সূত্রে গাঁথবার জন্য এবং সুবিধাবাদীদের অনুপ্রবেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানের শর্তাবলী এবং এই কংগ্রেসেই তা গৃহীত হয়।

কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের সামনে লেনিন সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথাই ছিল ঃ "বিপ্লবী মার্কসবাদের মূল নীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সংগঠিত করতে হবে; কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার প্রস্তুতির কাজে সুদৃঢ় সংকল্প নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নামতে হবে এবং এ কাজে মার্কসীয় রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের অপূর্ব দক্ষতা তাদের দেখাতে হবে।"

তৃতীয় কংগ্রেস

কমিনটার্ণের তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই কংগ্রেস এমনই একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হয় যখন শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণির নতুন এক অভিযান শুরু হয়েছে। তখন জার্মানি আর হাঙ্গেরীতে শ্রমিকদের বিপ্লবী অভিযান ব্যর্থ হয়েছে এবং ইতালীতে ফ্যাসিবাদ মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে।

তাই কংগ্রেসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হলো যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে ধনিকশ্রেণি ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে শুধু অক্ষুন্ন রাখতেই সক্ষম হয়নি, তারা শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণও শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস থেকে সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নিকট আহ্বান জানানো হলো: " জনগণের মধ্যে যাও" এই প্রধান স্লোগানের কথা মনে রেখেই বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্যে, ট্রেড ইউনিয়নে, কো-অপারেটিভ, যুব ও মহিলাদের মধ্যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হলো। আর আংশিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর কংগ্রেস জোর দিল। এসব দাবি নিয়ে সংগ্রাম করাকে যারা সংস্কারবাদ বলে অভিহিত করে থাকে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে কংগ্রেস সতর্কবাণী উচ্চারণ করল। এই রকম সংগ্রামে অন্যান্য শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের ভিত্তিও এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেই রচিত হল। পরবর্তীকালে এই সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের নীতিই এই কমিউনিস্ট কর্মনীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসে প্রধানত: মধ্যপন্থী আর সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল।

চতুর্থ কংগ্রেস

কমিনটার্ণের চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯২২ সালে। লেনিনের জীবনে আন্তর্জাতিকের এই হচ্ছে শেষ কংগ্রেস। চতুর্থ কংগ্রেসের সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

তৃতীয় কংগ্রেসের সময় ধনিকশ্রেণির প্রতিআক্রমণের যে সূচনা দেখা দিয়েছিল তা-ই ব্যাপকরূপ ধারণ করলো চতুর্থ কংগ্রেসের সময়। ফ্যাসিবাদের

মধ্য দিয়েই এই প্রতিআক্রমণ চরম আকার ধারণ করল। কংগ্রেসের কয়েক মাস আগেই ঘটল ইতালীর ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনীর রোম অভিযান আর ইতালীতে তার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। এই ফ্যাসিবাদের বিপদ তখন দেখা দিয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গেরীতে, বলকান অঞ্চলের প্রায় সবগুলি দেশে, পোল্যান্ডে, জার্মানিতে, অষ্ট্রিয়ায় এবং আমেরিকায়।

কংগ্রেসের প্রস্তাবে তাই ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলো। কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল সম্মিলিত ফ্রন্টের কর্মনীতি। কংগ্রেসের প্রস্তাবে তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 'জনগণের মধ্যে যাও' এর উপর আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলো।

সম্মিলিত ফ্রন্টের সংগ্রাম তো সবে শুরু হয়েছে এবং এই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একটি সমগ্র যুগ ধরেই চলবে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত এই সম্মিলিত ফ্রন্টের কাজের ধারা কী হবে, তারও আভাস দেওয়া হলো কংগ্রেসের প্রস্তাবে। এই প্রসঙ্গেই সম্মিলিত ফ্রন্ট সরকারের সম্ভাবনার মূল প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো। কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো যে, পাঁচ রকমের সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

১। উদারনৈতিক শ্রমিক সরকার।

২। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক সরকার।

৩। শ্রমিক- কৃষকদের সরকার।

৪। এমন একটি শ্রমিক সরকার যাতে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করে।

৫। প্রকৃত প্রলেতারীয় শ্রমিক সরকার যা কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারে।

এইসব সরকার সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে তা বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো ঃ " প্রথম দু ধরণের সরকার বিপ্লবী শ্রমিকদের সরকার নয়, এ হচ্ছে বুর্জোয়া আর বিপ্লব বিরোধী গ্রুপের প্রচ্ছন্ন কোয়ালিশন। এরকম সরকারে কমিউনিস্টরা কখনই অংশগ্রহণ করতে পারে না। বরং এই রকম সরকারের প্রকৃত চরিত্র জনগণের সামনে নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করে দিতে

হবে।"

" তৃতীয় ও চতুর্থ ধরণের সরকার প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নয়; প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে তারা উত্তরণের অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক রূপও নয়। কিন্তু যেখানে এ রকম সরকার গঠিত হয় সেখানে এগুলিকে একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামের সূচনা হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।"

" কেবলমাত্র কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত শ্রমিক সরকারই শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের প্রকৃত রূপ হতে পারে।"

কংগ্রেসের প্রস্তাবে এ কথাও বলা হলো যে, " যে সব শ্রমিকেরা এখনো প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আবশ্যিকতা উপলব্ধি কতে পারেনি তাদের সঙ্গে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক, খ্রিশ্চিয়ান সোস্যালিস্ট, নির্দলীয় শ্রমিক এবং সিন্ডিক্যালিস্ট শ্রমিকদের সঙ্গে একই সংগ্রামে হাত মেলাতে কমিউনিস্টরা ইচ্ছুক। সুতরাং বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ গ্যারান্টি পেলে কমিউনিস্টরা অকমিউনিস্ট সরকারকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে জনগণকে বলে যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া প্রকৃত শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।"

এভাবে নতুন পরিস্থিতিতে লেনিনের নেতৃত্বে কমিনটার্ণ সংগ্রামের নতুন রণকৌশল রচিত হলো।

পঞ্চম কংগ্রেস

কমিনটার্ণের পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে জুন- জুলাই মাসে (১৭ জুন থেকে ৮ জুলাই) লেনিনের মৃত্যুর ছয় মাস পরে। এই কংগ্রেস থেকেই কমিনটার্ণের নেতৃত্বে গ্রহণ করলেন স্তালিন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তখন একদিকে যেমন রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছে, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসেছে কিছুটা সুস্থিতি। ফলে সকল ফ্রন্টেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির সাহায্যে ধনিকেরা সাময়িকভাবে হলেও তাদের ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই পঞ্চম কংগ্রেস সম্মিলিত ফ্রন্টের স্লোগানের উপর বিশেষ জোর দিল। এই কংগ্রেসেই মার্কসবাদী তত্ত্বে লেনিনের বিরাট অবদানের কথা স্মরণ করে মার্কসীয় তত্ত্বের নতুন নামাকরণ করা হলো " মার্কসবাদ - লেনিনবাদ"

শ্রমিক ঐক্যের সংগ্রামে এই কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলো। এই কংগ্রেসেই সিদ্ধান্ত হয়ে যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একটি প্রোগ্রাম রচনা করা দরকার এবং এই প্রোগ্রাম রচনার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়।

ষষ্ঠ কংগ্রেস

কমিনটার্ণের ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে। এই কংগ্রেসেই রচিত হয় কমিনটার্ণের প্রথম সর্বব্যাপক প্রোগ্রাম। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজ সম্পর্কে বলা হয় : প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজমের দিকে শ্রমিকশ্রেণির অধিকাংশকে জয় করে আনবার জন্য বুর্জোয়া শান্তিবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের বিপদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকদের মেহনতী জনগণের সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে রূপান্তরিত করতে হবে গৃহযুদ্ধে, ধ্বংস করতে হবে ফ্যাসিবাদ, উচ্ছেদ করতে হবে ধনতন্ত্রকে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সোভিয়েত রাষ্ট্র শক্তি, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে উপনিবেশগুলিকে এবং দুনিয়ার প্রথম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে।

এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করার নির্দেশই দিল ষষ্ঠ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই ঘোষণা করা হলো, ধনতন্ত্র আর যুদ্ধ অভিন্ন এবং কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের অবসানেই যুদ্ধের অবসান সম্ভব।

উপনিবেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে এই কংগ্রেসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় " সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো পরের কথা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব ছাড়া সমাপ্ত করা যেতে পারে না। আর শ্রমিকশ্রেণির এই নেতৃত্বের অঙ্গ হলো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা।"

সপ্তম কংগ্রেস

কমিন্টার্ণের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩৫ সালে। ষষ্ঠ কংগ্রেস আর সপ্তম কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে দুনিয়ায় দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের নতুন বিপদ। জার্মানীতে হিটলারের নাৎসীবাদের আবির্ভাবে ফ্যাসিবাদ উগ্ররূপ ধারণ করে। ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিপদ রুখবার জন্য এই কংগ্রেসে ঘোষিত হলো জনগণের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টের, সংক্ষেপে পিপলস ফ্রন্টের কর্মনীতি। এই পিপলস ফ্রন্টের প্রাণ কেন্দ্র হবে শ্রমিকশ্রেণির সম্মিলিত ফ্রন্ট। কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হলো যে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী পিপলস্ ফ্রন্ট। শ্রমিকশ্রেণির সম্মিলিত ফ্রন্ট আর জনগণের ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের কাজ একই সঙ্গে চালাতে হবে। এই কাজ কংগ্রেসের সামনে নিয়ে এল পিপলস ফ্রন্ট সরকার গঠনের সম্ভাবনার প্রশ্ন।

সপ্তম কংগ্রেসে ঘোষণা করা হলো যে, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের পূর্বেই বর্তমানে এই পিপলস ফ্রন্ট সরকার গঠিত হতে পারে। এ সরকারের থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট ফ্যাসি- বিরোধী প্রোগ্রাম। এই সরকার গঠিত হবে প্রকৃত গণ-আন্দোলনের ফলে। এর থাকবে শ্রেণিসংগ্রামের কর্মনীতি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বর্তমান স্তরে এরকম সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে এটা বুর্জোয়া একনায়কত্ব থেকে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের উত্তরণের কোন অধ্যায় নয়— এটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয়।

কমিন্টার্ণের এটি হলো শেষ কংগ্রেস। সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ফ্যাসিবাদ

ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে নতুন গণআন্দোলনের সূচনা করলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে যুদ্ধের জন্য। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছে। অপরদিকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ বন্ধ করার মতন যথেষ্ঠ গণ— আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না।

এই পরিস্থিতিতে শুরু হলো ইউরোপে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারের সমর অভিযান—শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশই হিটলার বাহিনীর পদানত হলো।

১৯৪১ সালের ২২ শে জুন, হিটলার আক্রমণ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নতুন রূপ গ্রহণ করল। ঐ বছরের শেষ দিকে জাপানও যুদ্ধ ঘোষণা করল ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে।

চীনকে গ্রাস করার জন্য জাপান ১৯৩১ সাল থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল। সেই যুদ্ধকে জাপান বিস্তৃত করল প্রশান্ত মহাসাগরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন সুস্পষ্ট দুই শিবিরের যুদ্ধে পরিণত হলো— একদিকে ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তি (জার্মানী, ইতালি ও জাপান) অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশের মিত্রশক্তি।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও কমিনটার্ণের অবসান

এই যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক। কমিনটার্ণের বিভিন্ন শাখার সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তার কারণও বিবৃত করা হলো কমিনটার্ণের কার্যকরী কমিটির একটি প্রস্তাবে।

প্রস্তাবে বলা হলো যে, " যুদ্ধের অনেক অগেই এ কথা দিনের পর দিন অধিক মাত্রায় সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে; কোন একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যাগুলির সমাধানের পথে

অনতিক্রম্য বাধাই অর্থাৎ দেশে দেশে তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিজ নিজ দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ করে বিপ্লব সফল করার দায়িত্ব তখন এক একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর এসে পড়েছে।

এই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক, তা প্রমাণিত হলো যুদ্ধান্তে চীনের বিপ্লবের, ভিয়েতনামের বিপ্লবের সাফল্যে। ১৯৪৯ সালে চীনে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, আর যুদ্ধের পর ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনামে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।

এভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক তার বিপ্লবী ভূমিকা সমাপ্ত করলো। তৃতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী, জাতি- দাম্ভিক, সমাজবাদী,বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া আবর্জনাগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব কার্যকরী করার পথই প্রদর্শন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইউরোপের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিন্টার্ণের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠে। এমনকি প্রতিরোধী সশস্ত্র লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডও সামিল হয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলির কমিউনিস্টরা জাতীয়মুক্তির আন্দোলনের সাথে যৌথ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিস্তৃতি, ফ্যাসিবাদ বিরোধী কাজে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দ্রুত মোকাবিলা এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ইত্যাদি বিষয়গুলিতে আরও কার্যকরী স্বাধীন ভূমিকা ও উদ্যোগ নেওয়া সেই সময়ে বিশেষ জরুরি ছিল। তাই ১৯৪০ সালে কমিন্টার্ণের নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন " প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করার যে পথ গ্রহণ করেছিল, যা সেই সময়ে শ্রমিক-শ্রেণির আন্দোলনে খুব প্রয়োজনীয় ছিল, বর্তমানে তা আন্দোলনের মাত্রা ও অগ্রগতির ফলে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে জটিলতা বাড়ছে তা জাতীয়স্তরে শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলির আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করছে।"

এই অবস্থায়, কমিন্টার্ণের কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী সমস্ত অংশের সম্মতি নিয়ে ১৯৪৩ সালের মে মাসে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে, ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভাপতিমণ্ডলী আন্তর্জাতিকের সমস্ত সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন " জনগণের মুক্তির সংগ্রামে এবং যে সমস্ত দেশে হিটলার বিরোধী ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠেছে, শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক শত্রু ও জার্মান ফ্যাসিস্ট এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে সমস্ত সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।"

প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদের আদর্শের ভিত্তিতে সর্বহারাদের পার্টির গঠন ও তাকে শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় দলগুলির বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জন্ম এখান থেকেই। কমিন্টার্ণ ছিল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, যা বর্তমানে নূতন ধরণ ও অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এই মঞ্চ বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে মানবিক ধারাকে আয়ত্ত করতে সহায়তা করেছে। শান্তির জন্য সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে। প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার সময় কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস এর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে সংহত করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং সম্ভাবনা দেখেছিলেন, তিনটি আন্তর্জাতিকের কাজের প্রভাবে তা বাস্তবায়িত করার কাজ বিশ্বে অব্যাহতভাবে হয়ে চলেছে।